তদন্ত কে করবে, শালা!

নিজের স্মৃতিকথা লিখছি গত তিন বছর ধরে। এখনও শেষ হয়নি। শহিদ সপ্তাহ উপলক্ষে বইয়ের একটা পরিচ্ছদ আলাদা ছাপতে দিলাম। এতে সরোজ দত্তের কথা আছে। তাঁর সহধর্মিণীর কথাও আছে। **-বাবু সিংহরায়**

বেলাদি গতবছর চলে গেলেন।

তাঁর প্রয়াণের তারিখ ঊনত্রিশে সেপ্টেম্বর, দু'হাজার সতের। সতেরই অক্টোবর অনেকে ভারতসভা হলে জড়ো হয়ে তাঁকে স্মরণ করল। একটা তথ্যচিত্র দেখাচ্ছিল। বেলাদির ইন্টারভিউ।

তাঁর মৃত্যুর অল্পদিন আগে ইন্টারভিউ নিয়েছে। কমরেড বেলা দত্ত তখন নব্বই উত্তীর্ণা। কয়েক বছর আগে কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। ঠোঁট বেঁকে গেছে। কথা জড়িয়ে যায়। তবু বুঝতে খুব অসুবিধা হয় না।

তাঁর ছেলে কুণাল ইন্টারভিউ নিচ্ছে।

সে জিজ্ঞাসা করল, বোমা ছুঁড়তে পার?

বৃদ্ধা ফোকলা দাঁতে হেসে বললেন, হ্যাঁ।

হাসিটা খুব চেনা। সরোজ দত্তের পারিবারিক ছবিতে এক তরুণীকে অমন হাসতে দেখেছি। নব্বই পেরিয়েও হাসিটা প্রায় একইরকম।

-বোমা বাঁধতে জানো?

বৃদ্ধা ফের হেসে একটু এদিক ওদিক তাকালেন।

বর্ষীয়সীরা যেমন করে নাতনিদের বড়ি দেওয়া অথবা আম কাসুন্দি বানানো শেখান, তিনি অনেকটা সেইরকম ভঙ্গিতে বোমা বানানোর কথা বললেন, সিগারেটের টিনে ঠেসে ঠেসে মশলা ভরতে হয়। এই এত্তবড় হয় এক-একটা। দুম্ করে ছোঁড়ে ...।

কলেজে পড়ার সময় বেলাদির রাজনীতিতে হাতেখড়ি। ছেচল্লিশ সালে উত্তাল তেভাগা আন্দোলনে ঝাঁপ দিয়ে পড়া। সাতচল্লিশে সরোজ দত্তের ঘরণী। কিন্তু ঘর গেরস্থালিতে মন দেওয়ার পরিবর্তে নববধূ চললেন গ্রামে।

হাওড়ার দখিনবাড়ি অঞ্চলে তেভাগার সময় চাষিরা পদ্মা নামে এক সংগঠককে খুব চিনত। পুলিশও খুঁজছিল।

ওই হল বেলাদির ছদ্মনাম।

সাতচল্লিশ-আটচল্লিশ সালে তিনি তেভাগার দক্ষ সংগঠক। রোজ পুরো এলাকা চষে বেড়াচ্ছেন। চাষিবউদের নিয়ে গেরিলা স্কোয়াড বানাচ্ছেন। পুলিশের গলা কেটে রাইফেল কেড়ে নিয়েছেন। বোমাও ছুঁড়েছেন কত।

তিনি বোমা বানাতে জানবেন না তো কে জানবে!

কুণাল প্রশ্ন করল, সরোজ দত্তের মৃত্যুর তদন্ত চাও?

এইবার বৃদ্ধা রেগে গিয়ে বললেন, তদন্ত কে করবে, শালা!

ঠিক কথা। বাম-কংগ্রেস সবার হাতেই তো সরোজ দত্তের রক্ত। তাঁর ক্ষুরধার লেখনী কাউকে ছাড়ত না। সবাই মিলেই তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল। ষড়যন্ত্রীরা নিজেরাই আবার তদন্ত করবে কি!

বেলাদির মুখে ওই কথা শুনতে শুনতে একাত্তরের দিনগুলো মনে পড়ছিল। সরোজ দত্ত যখন শহিদ হন, সেই সময়টায় আমি বাড়িছাড়া। কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে হাওড়া শহরের উপকণ্ঠে দক্ষিণ বাকসাড়া নামে এক জায়গায় থাকতাম। গোপন আস্তানা।

তখন নকশাল আন্দোলনে ভাঙন ধরেছে। সকলেই নার্ভাস। সেই নার্ভাসনেসের জন্যই একদিন আমি ও এক বন্ধু ধরা পড়তাম।

একাত্তরের জুন-জুলাই মাসের কথা। দেশব্রতীর নতুন সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। আমরা কলেজ স্ট্রিটের এক গোপন আস্তানা থেকে আনতে গেছি। ট্যাক্সির ডিকিতে ভরে পত্রিকার বান্ডিলগুলো নিয়ে আসছি এমন সময় দেখি পিছনে পুলিশের গাড়ি। বন্ধু তো খালি পিছু ফিরে দেখছে। যত বলি ওরে তাকাসনি, ওদের সন্দেহ হবে, তত ফিরে ফিরে তাকায়। বেচারা নার্ভাস হয়ে গেছে, নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই বার বার ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে ফেলছে। শেষকালে হাওড়া স্টেশনে এসে দেখি, গাড়িটা নেই। তখন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল।

আমরা বুঝতে পারছি, দক্ষিণ বাকসাড়া আর বেশিদিন নিরাপদ নয়। শহর যখন একদম ঠান্ডা হয়ে যাবে, তখন পুলিশের নজর পড়বে এইদিকে। সেই দিনটা খুব বেশি দেরি নেই।

তার আগে আমাদের চলে যেতে হবে আরও দূরে।

আমরা সকলেই আশ্রয়ের সন্ধানে আছি। এমন সময় কে যেন খবর আনল, চম্পাহাটির কাছে বোদরা নামে একটা গ্রাম আছে। সেইখানে আমাদের এক সমর্থক থাকে। তার কাছে গেলে আশ্রয় মিলবে। এমনকী গ্রামের চাষিদের জড়ো করে সংগঠনও গড়া যেতে পারে।

ঠিক হল, আমি যাব।

দক্ষিণ বাকসাড়া থেকে শিয়ালদা। ট্রেনে চড়ে চম্পাহাটি। সেখান থেকে বোদরার বাস পাই না। শেষকালে দেখি একটা ইটের লরি। ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করলাম, বোদরার দিকে যাবেন নাকি? সে বলল, উঠে আসুন।

বোদরা গ্রামের কিছু দূরে নামিয়ে দিয়ে গেল।

ঠা ঠা রোদে গ্রামের রাস্তা দিয়ে হাঁটছি। এমন সময় এক পরম আত্মীয়ের দেখা পেলাম। সে আমাকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে

দিয়েছিল।

আমি এক নাম না জানা গ্রামের পথ ধরে হেঁটে চলেছি। রাস্তায় কাউকে দেখলে জিজ্ঞাসা করব, বোদরা গ্রাম এখান থেকে কত দূরে মশাই?

কিছুদূর হাঁটার পরে দূরে দেখছি একজনদের বাগান। আমার বয়সী একটা ছেলে মাটি কোপাচ্ছে। লুঙি পরা খালি গা। সে আমাকে দূর থেকে লক্ষ করছে। ভাবছি ওকেই জিজ্ঞাসা করি।

এমন সময় সে-ই হাত নেড়ে আমাকে ডাকল, ও দাদা ও দাদা শুনছেন...

কাছে যেতে জিজ্ঞাসা করছে, আপনি কে? কোথা থেকে আসছেন?

আমি আমতা আমতা করছি।

সে ফিসফিসিয়ে বলল, আপনি কি নকশাল? তা হলে আর সামনে এগবেন না। হাওয়া গরম। এক্ষুণি ফিরে যান।

আমি আর এগোলাম না। পরে শুনি, পাশের গ্রামের তহশীলদার গুন্ডাদের জড়ো করে রেডি হয়ে ছিল। কোনও নকশাল ঢুকলেই মারবে। কয়েকদিন আগে একজনকে ওইরকম পিটিয়ে মেরেছে।

আমি যে সমর্থকের বাড়িতে যাচ্ছিলাম, এ হল সেই ছেলে। কেমন করে যেন আমাকে দূর থেকে দেখেই চিনতে পেরেছিল।

কয়েকদিন পরে এক মেঘলা দিনের সকালে রবীনদা এসে খবর দিলেন, সরোজ দত্ত আর নেই।

আমি তাঁকে কখনও দেখিনি। কিন্তু তাঁর লেখা খুব আগ্রহ নিয়ে পড়তাম। আমার বয়সী সকলেই নতুন দেশব্রতী হাতে পেলে প্রথমে পাতা উল্টে খুঁজত, শশাংকের লেখা কোথায়। সরোজ দত্তের ছদ্মনাম শশাংক।

তিনি শহিদ হওয়ার পরে চারুবাবু যে অবিচুয়ারি লিখেছিলেন, সে বিখ্যাত হয়ে আছে।

...সরোজ দত্তের ক্ষুরধার লেখনিকে ভয় করত না এমন কোনও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি নেই। তাই পুলিশ বাহিনী বিচারের প্রহসন করার পর্যন্ত সাহস পেল না। সেই রাতেই তাঁকে হত্যা করল।

তাঁর মৃত্যুর পরে একে একে কেটে গেছে প্রায় পাঁচটি দশক। তাঁকে নিয়ে অনেকে লিখেছেন। সেসবের কিছু কিছু পড়েছি। অনেকের কাছে তাঁর কথা শুনেওছি। আমার মনে তাঁর একটা ছবি আঁকা হয়ে গেছে।

সরোজ দত্তের জন্ম ঊনিশশ চোদ্দ সালে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরুর বছরে। যশোর জেলার নড়াইল মহকুমায় থাকতেন। বাড়ির কাছ দিয়ে ভদ্রা নামে এক নদী বইত।

এক দুর্যোগের দিনে নদীর বাঁধ ভেঙে গেল। হু হু করে জল ঢুকছে। বিঘের পর বিঘে ধানজমিতে কোমর সমান জল। তখন ব্রিটিশ আমল। সরকার বলল, বাঁধ সারাতে অন্তত ছ'মাসের ধাক্কা। তার মানে এ বছরের মতো চাষবাসের দফারফা।

ওই অঞ্চলের নেতা ছিলেন বিষ্টু ঘোষ। প্রথম জীবনে কংগ্রেসি, পরে কমিউনিস্ট। তিনি চাষিদের ডেকে বললেন, আসুন আমরা নিজেরাই সারিয়ে ফেলি। এই বলে লালফৌজের মতো অমিত বিক্রমে এক রাতে বাঁধ সারিয়ে ফেললেন।

এই বিষ্টু ঘোষ সরোজ দত্তের কিশোর বয়সের নেতা।

পরিণত বয়সে তিনি ছিলেন কবি, সাংবাদিক এবং সবার ওপরে নিষ্ঠাবান রাজনৈতিক কর্মী। সাম্যবাদী আদর্শে নিবেদিত প্রাণ। নিজের সম্পর্কে লিখেছিলেন, আমার কবিতা কভু কহিবে না আমার কাহিনী...।

তাঁর কবিতায় এরকম আরও স্মরণীয় লাইন আছে। কালীদাসের শকুন্তলাকে নিয়ে কবিতা লিখেছিলেন, কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গি একেবারে বিপরীত। বেশ বড় কবিতা। তার মূল কথা হল,

রাজার লালসাযূপে নিহত অসংখ্যের এক নারীমেধ

দৈবের চক্রান্ত বলি রাজকবি করেছে রটনা...

পরিচিতরা সরোজবাবুর যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা এইরকম--

বেঁটেখাটো লোক, পরনে সস্তা দামের ধুতি, পাঞ্জাবি অথবা হাফ হাতা শার্ট। চেহারায় নজর করার মতো কিছু নেই, শুধু চোখদু'টি খুব গভীর।

তিনি ফুটপাথ দিয়ে হন হন করে হাঁটেন, নাম্বার টেন সিগারেট খান, কখনও সখনও সাদা পান।

তাঁর লেখায় অত শ্লেষ, ক্রোধ ও তৎসম শব্দের ঝংকার, কিন্তু বাইরের জগতে মানুষটির কথাবার্তা, আচরণ একেবারেই ভিন্ন ধরনের। দিব্যি আমুদে, দিলখোলা লোক, যশোরের ডায়লেক্টে বাংলা বলেন, অতদিন কলকাতায় থাকার পরেও।

অপরকে এবং নিজেকে নিয়ে আজগুবি, হাস্যকর গল্প বানাতে তাঁর জুড়ি নেই।

তিনি খবরের কাগজের লোক। যাকে বলে নিউজপেপার ম্যান। লঘু গদ্যে দেশ-বিদেশের খবর লেখেন চমৎকার, হেডিংও দেন লাগসই। আপিসে কাজের সময় টেবিল জুড়ে জমিয়ে তোলেন আড্ডা। তাঁর থিওরি হল, খবরের কাগজের আপিসে আড্ডা হলে তবে হাত দিয়ে সরেস লেখা বেরয়।

তাঁদের অরণী পত্রিকার আড্ডায় এমনি জমে উঠত রস। আসর জমাতেন স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, সোমনাথ লাহিড়ি, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, হীরেন মুখার্জি। এক একদিন স্বামী বিবেকানন্দের ভাই ভুপেন দত্ত পর্যন্ত হাজির হতেন।

তাঁরা বাংলার শ্রেষ্ঠ সাংবাদিক, কবি, রাজনৈতিক কর্মী, দার্শনিক। তাঁদের কথায় বার্তায় আর রঙ্গরসিকতায় ঝলসে উঠত ইনটেলেকটের দ্যুতি।

এই আড্ডার কথা শুনলে ঈর্ষা হয়। আমরা তো এমন পাইনি কখনও।

সরোজ দত্তের বুদ্ধিজীবী মহলে এত বন্ধু, তবু সেই চারের দশকের গোড়ায় লিখে গেছেন, ইন্টেলেকচুয়ালি কুসংসর্গ হইতে সাম্যবাদের সাবধান হইবার দিন আসিয়াছে।

তিনের দশকের শেষদিক থেকে দেখেছিলেন, বুদ্ধিজীবী, লেখক, গায়ক, অভিনেতারা কেমন গণনাট্য সংঘ, কমিউনিস্ট পার্টির ছত্রছায়ায় এসে আখের গুছিয়ে নিচ্ছে। তাই বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন।

এম এ পাশ করার পর অমৃতবাজার কাগজে সাব এডিটরের চাকরি। রোজকার কাজ ছিল, দেশি-বিদেশি নানা সংবাদ সংস্থা টেলিপ্রিন্টারের মাধ্যমে যে খবর পাঠায়, সেসব গুছিয়ে লিখে, উপযুক্ত শিরোনাম সহযোগে পাঠকের কাছে পরিবেশন করা।

সংবাদ সংস্থার খবর নিয়েই গোলযোগের সূত্রপাত।

এখন যে দেশটাকে মালয়েশিয়া বলে, তখন তার নাম ছিল মালয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে সেখানে কমিউনিস্ট আন্দোলন খুব তেজি হয়ে উঠল। তখনও পর্যন্ত ব্রিটিশরা সেদেশের মালিক। বামপন্থী গেরিলা ঠেকাতে গিয়ে তাদের নাজেহাল অবস্থা।

ব্রিটিশদেরই এক সংবাদসংস্থার নাম রয়টার্স। অমৃতবাজার ছিল তাদের গ্রাহক। রয়টার্স টেলিপ্রিন্টারে যে খবর পাঠাত, তাতে মালয়ে যুদ্ধরত কমিউনিস্টদের বলত ব্যান্ডিট, যার মানে ডাকাত।

অমৃতবাজারের মালিকরা বলল, আমাদের কাগজেও ওদের ব্যান্ডিট লিখতে হবে। সরোজবাবু ও সমধর্মী আরও কয়েকজনের ঘোর আপত্তি। এই নিয়ে মালিকপক্ষের সঙ্গে বিরোধ। ধর্মঘটও হল। শেষকালে মালিক খুব গম্ভীর মুখ করে বলল, উহুঁ, আমার আপিসে কমিউনিজম বরদাস্ত নয়। অতএব সরোজ দত্তরা বরখাস্ত।

চাকরি খোয়ানোর পর তাঁরা জনাকতক বন্ধু মিলে কার্ডবোর্ডের ব্যবসা করেছিলেন। ব্যবসায় শিশুশ্রমিকরা কাজ করত। তাদের প্রতি আবার সরোজবাবুর খুব মায়া। মজুরের প্রতি দরদ থাকলে কি আর ব্যবসা হয়?

কার্ডবোর্ডের কারবার উঠে যাওয়ার পরে তিনি হাওড়ার আন্দুলে এক স্কুলে ইংরেজি পড়াতেন। বেশিদিন চাকরি করা পোষায়নি।

কর্মজীবনের বেশিরভাগ সময় দলীয় পত্রপত্রিকায় সাংবাদিকতা করেছেন। পার্টির থেকে একটি পয়সাও নিতেন না। বেলাদি তেভাগা থেকে ফিরে কলকাতায় চাকরি নিয়েছিলেন। তাতে সংসার চলত।

একাধিকবার জেল খেটেছেন। শেষবার জেলে যাওয়া বাষট্টি সালে চিনযুদ্ধের সময়। জেলে চারু মজুমদার, কানু সান্যালের সঙ্গে আলাপ।

নকশালবাড়ির ঘটনার পরে পুরানো পার্টির বন্ধুদের সঙ্গে বিচ্ছেদ। নতুন কাগজ বেরল। নাম দেশব্রতী। সরোজ দত্ত ছাড়া আর কেই বা তার সম্পাদক হতে পারেন।

তারপর ঊনিশশ সত্তর সাল। চারদিকে উথাল পাথাল। অস্ত্রের ঝনঝনানি। খতম অভিযান।

সরোজ দত্তের কলম হয়ে উঠল আরও শানিত।

সেবার মূর্তিভাঙা নিয়ে রাজ্য জুড়ে বেজায় হইচই। অতুল্য ঘোষ, প্রমোদ দাশগুপ্তের মতো প্রবীণরা আমাদের শাপশাপান্ত করছেন। প্রিয়-সুব্রত এবং সমসাময়িক অন্যান্য চ্যাংড়াও গলাবাজি করছে খুব। বিদ্বজ্জনেরা ছেলেদের কালাপাহাড়ি কীর্তিকলাপের কথা বলতে গিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠছেন। তার চেয়েও বড় কথা, সুশীতল রায়চৌধুরীর মতো পার্টির প্রবীণ নেতা পর্যন্ত থতমত খেয়ে গেছেন।

এটা কীরকম হচ্ছে?

গান্ধি, নেহরু না হয় বজ্জাত, কিন্তু রামমোহন, বিদ্যাসাগরের গায়ে হাত কেন? তাঁরা তো বুর্জোয়া বিপ্লবের আমলের বুদ্ধিজীবী, এই অশিক্ষা-কুশিক্ষার রাজত্বে মানুষকে জ্ঞানের আলো দেখিয়েছেন।

সরোজ দত্ত এসবের জবাবে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছিলেন, 'মূর্তিভাঙার সমর্থনে'।

ওখানে তাঁর মনীষার সর্বোত্তম পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রবন্ধের মূল কথা হল, আমাদের শাসকেরা প্রকৃত দেশপ্রেমিকদের বাদ দিয়ে এমন সব লোককে মহাপুরুষ বলে তুলে ধরেছে যারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের দালাল ছিল। সেই জাল মহাপুরুষদের মূর্তি চতুর্দিকে সাজিয়ে রেখেছে। প্রতিবছর জন্মদিনে তাদের পায়ে ঘটা করে পুজো দেয়। জনগণ যাতে ওই মহাপুরুষদের মতো বিপ্লব বিমুখ হয়ে ওঠে সেজন্য অত ভড়ং।

এখন কৃষকরা গ্রামাঞ্চলে যে গেরিলা যুদ্ধ শুরু করেছে, তারই আলোকে ছাত্র-যুবরা চিনে ফেলেছে ঊনিশ শতকের তথাকথিত মহাপুরুষদের আসল রূপ। তাই এই মূর্তিভাঙার ধুম।

এবারের আন্দোলনের চরিত্র আগের চেয়ে অনেক পৃথক। পুরানো ধ্যানধারণা দিয়ে তাকে বোঝা যাবে না। তেমন চেষ্টা করতে গেলে প্রজাপতি ধরার জাল দিয়ে সিংহ ধরতে যাওয়ার মতোই মূঢ়তা হবে।

সরোজ দত্তের এই শেষের কথাগুলি খুব গুরুত্বপূর্ণ। একটু ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন।

আমরা জানি, শাসকরা প্রায়ই বড় মুখ করে বলে, মানুষ আন্দোলন করে করুক, কিন্তু আইন যেন না ভাঙে।

অনেক সময় আন্দোলনকারী জনতাকে হত্যা করে বলে, ওরা আইন নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছিল। পুলিশ বাধ্য হয়ে গুলি চালিয়েছে।

তার মানে শাসক চায় আন্দোলন হোক ওদের রুলবুক মেনে।

কিন্তু আন্দোলন ওভাবে হয় না। ইতিহাস নিজের নিয়মে এগয়। কারও আইনের তোয়াক্কা করে না, সে যতবড় শাসকই হোক না কেন।

যারা রুলবুক মেনে আন্দোলন করতে বলে তারা আসলে আন্দোলনের শত্রু।

মুশকিল হল, আইন শুধু শাসকেরই আছে এমন নয়। আমাদের প্রত্যেকের মাথার ভিতরেও একটা করে নিজস্ব রুলবুক আছে।

জীবনের ভালোমন্দ নানা অভিজ্ঞতা থেকে আমরা একরকম ধারণা করে নিই, কোনটা করা উচিত আর কোনটা নয়। ওইভাবে রুলবুকটি তৈরি হয়। মুশকিল হয় তখনই যখন আমরা মাথার ভিতরকার ধারণাগুলোর সঙ্গে বাস্তবের আন্দোলনকে মিলিয়ে দেখি, কোথাও বিচ্যুতি হচ্ছে না তো?

বেশিরভাগ সময় মেলাতে পারি না। তখন বলে উঠি, ছি ছি এ কী অনাচার! এই বলে আন্দোলনে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করি।

সরোজ দত্ত বলেছেন, অমন করবেন না। পূর্ব অভিজ্ঞতা দিয়ে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডকে বিচার করতে যাবেন না। অভ্যুত্থানের সময় জনতা এমন অনেক কিছু ঘটিয়ে ফেলে যা আগে কেউ ভাবতেও পারেনি। তা বলে ভাববেন না যে, আন্দোলন বিপথে গেছে।

মনে রাখবেন, জনতা কখনও ভুল করে না।

সরোজ দত্ত কবি। তাই ছাত্র-যুব জনতার কাজকর্ম নিয়ে কাব্যিক ঢংয়ে লিখেছেন,

...পার্টি গুহামুখ থেকে ঠেলে পাথর সরিয়ে দিয়েছে। উন্মুক্ত জলস্রোত যত নীচে নামছে তত প্রবল ও ব্যাপক হচ্ছে। তার সামনে বেত হাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে 'ওদিকে যেও না', 'ও ক্ষেত ভাসিও না', 'ও গ্রাম ডুবিও না' বলে মাস্টারি করার মতো মূঢ় আমাদের পার্টি নয়...।

সরোজ দত্তের সমসাময়িকরা প্রায় সকলেই যুবকদের বৈপ্লবিক আন্দোলনকে চ্যাংড়ামি বলে উড়িয়ে দেওয়ার মতো মূঢ়তা দেখিয়েছিলেন। কিন্তু সরোজ দত্ত সবসময় স্রোতের বিপরীতে। সত্তর-একাত্তরে দেশব্রতীর পাঠকদের বুঝিয়ে বলছেন, কেন মূর্তিভাঙা নকশালবাড়ির অভ্যুত্থানেরই একটা অংশ।

তাঁর পরিচিতরা জানিয়েছেন, মানুষটির মধ্যে কোনও অভিমান দেখিনি, শুধুমাত্র মনুষ্যত্বের অভিমান ছাড়া।

কোনও অভিমান তাঁর দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করেনি বলেই অমন উদার ও স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী হতে পেরেছিলেন। অপ্রত্যাশিতকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারতেন।

তাঁর চরিত্রে কঠোরতার দিকও ছিল। বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের প্রতি তিনি যত উদার, শত্রুর বেলায় ততোধিক নির্মম।

অমৃতবাজারে ধর্মঘটের সময় মালিক ঘোষবাবুরা একবার কর্মীদের আলোচনায় ডেকেছিল। সরোজ দত্ত গিয়ে দেখেন, আলোচনার টেবিলে অনেকগুলো প্লেটে থরে থরে সাজানো রসগোল্লা আর সন্দেশ। ধর্মঘটীদের প্রতিনিধি হয়ে যারা এসেছে, তাদের খাওয়াবে।

তিনি ধমকে উঠলেন, মালিকের পয়সায় মিষ্টি খাওয়া তো ঘুষ খাওয়ার সামিল। এখনই নিয়ে যান প্লেটগুলো।

আর একবারের কথা। রাস্তায় তাঁকে দেখে মালিক গাড়ি থামিয়ে বলল, আরে সরোজবাবু যে। উঠে আসুন গাড়িতে। যেখানে যাচ্ছেন পৌঁছে দেব।

তিনি বললেন, উঁহু, দরকার নেই। তারপর গটগট করে হেঁটে চললেন নিজের পথে ।

হয়তো তিনি ভেবেছিলেন, মালিকের গাড়িতে কর্মচারীর না চড়াই ভালো। কারণ গাড়ি তো মালিক যেদিকে বলবে সেদিকেই যাবে।

বুর্জোয়া পার্লামেন্ট সম্পর্কেও ওইরকম ভাবতেন। ওখানে যারা ঢোকে, তাদের বড়লোকেরা যেদিকে বলে সেদিকে যেতে হয়।

তিনি একাত্তরের মার্চে, খুন হওয়ার কয়েকমাস আগে লিখেছেন, জ্যোতি, প্রমোদ, হরেকেষ্ট প্রমুখ ভোটভিখারী সংশোধনবাদী কুত্তার দল... যখন বুর্জোয়া পার্লামেন্টের শুয়োরের খোঁয়াড়ে ঢোকার অজুহাত হিসাবে ঘন ঘন স্তালিনের উদ্ধৃতি দেয় এবং দন্তবিকশিত করে সভাসমিতিতে স্তালিনের জয়ধ্বনি করে তখন ইচ্ছা করে লাথি মেরে শালাদের দাঁতের পাটি খসিয়ে দিই।

সিপিএমের কেষ্টবিষ্টুরা তাঁর অনেক দিনকার বন্ধু। একসময়কার নেতাও বটে। কিন্তু তাদের প্রতিই তিনি সবচেয়ে বেশি আক্রমণাত্মক। আদর্শের লড়াইয়ে বন্ধু অথবা আত্মীয় কাউকে ছাড় দিতে নেই।

শত্রু জানত, লোকটা ভীষণ জেদি। কিছুতেই কথা শুনবে না। তাই ধরার কয়েকঘণ্টা পরেই কলকাতা ময়দানে নিয়ে গিয়ে গুলি করে মারল।

তিনি পাঁচই আগস্ট খুব ভোরবেলায় শহিদ হয়েছিলেন।

তাঁর অনুরাগীরা বহুবার এই হত্যাকাণ্ড নিয়ে তদন্ত দাবি করেছে। কিন্তু বাম-দক্ষিণ কোনও পক্ষ কান দেয়নি, স্বাভাবিক কারণেই। বেলাদিকেও তাঁর ছেলে ইন্টারভিউতে জিজ্ঞাসা করেছিল, তুমি কি তদন্ত চাও?

স্বয়ং সরোজ দত্তকে এই প্রশ্নটা করলে কী বলতেন?

আমি দৃশ্যটা কল্পনা করতে পারি।

পাঁচই আগস্টের ভোর। চরাচর জুড়ে ঝুম বৃষ্টি। সরোজ দত্ত হনহনিয়ে হেঁটে আসছেন ময়দানের দিক থেকে। পরনে সেই চিরাচরিত সস্তা ধুতি ও হাফ শার্ট।

পথের পাশ থেকে কেউ জিজ্ঞাসা করল,

- আচ্ছা সরোজদা, আপনার নিখোঁজ হওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে আর একবার তদন্তের দাবি তুললে কেমন হয়?

তিনি প্রশ্নটা শুনে ক্ষেপে উঠবেন।

- তদন্ত কে করবে শালা!

পুলিশ, প্রশাসন কিংবা ভোটের পার্টি, কারও প্রতি সরোজ দত্তের বিন্দুমাত্র মোহ নেই।

বেলাদিরও তাই। তিনি প্রকৃত অর্থে সরোজদার সহধর্মিনী। শহিদ স্বামীর স্মৃতি ও সত্তা নিয়ে এই সেদিনও পৃথিবীতে ছিলেন।

তাঁর থেকে আরও অনেক কিছু শোনার ও জানার ছিল। কিন্তু আমি কখনও তাঁর কাছে গিয়ে উঠতে পারিনি।

সে আমারই অক্ষমতা। কাকে আর দোষ দেব।